অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিশোর রচনা সমগ্র

নির্বাচিত অংশ

প্রথম খণ্ড

সংকলক
অশোককুমার মিত্র

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

॥ সূচিপত্র ॥

গল্প ও উপন্যাস	১৩ - ২২৬
শকুন্তলা	১৫
রাজকাহিনী	২৭
খাতাঞ্চির খাতা	১১৩
আলোর ফুলকি	১৫৩
হানাবাড়ির কারখানা	২১১
পুথি	২২৭ - ২৯৪
চাঁই বুড়োর পুঁথি	২২৯
স্মৃতিকথা	২৯৫ - ৪০৬
আপন কথা	২৯৭
ঘরোয়া	৩৩৩
যাত্রাগান	৪০৭ - ৬৯২
যাত্রাগানে রামায়ণ	৪০৯
অবনীন্দ্রনাথ	৬৯৩ - ৭০৮
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৯৩

॥ সম্পাদকের কথা ॥

অবনীন্দ্রনাথ বাংলা শিশুসাহিত্যের এক অবিকল্প রূপকার। যদিও চিত্রশিল্পে, সংগীত চর্চায় তাঁর প্রাথমিক আগ্রহ ছিল, তবু তাঁর রবিকাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় একদিন সাহস ভরে 'শকুন্তলা' লিখে ফেললেন। কালিদাসের কাব্য নির্ভর এ রচনার স্তবকে স্তবকে এক একটি ছবি যেন ফুটে উঠল। একটি রচনায় আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল। অতঃপর লিখলেন ক্ষীরের পুতুল—তাঁর কাকিমা মৃণালিনী দেবী সংগৃহীত বাংলার রূপকথার একটি গল্প ছিল এ উপাখ্যানের মূল সূত্র। তারপরে রাজকাহিনী, তারপরে ভূতপত্রীর দেশ, নালক, খাজাঞ্চির খাতা, বুড়ো আংলা, আলোর ফুলকি অসংখ্য পুথি ও পালাগান লিখেছেন মনের আনন্দে। তাঁর লেখায় রয়েছে কল্পনার উদ্দাম উল্লাস, ভাষার অনুপম কারুকাজ, আশ্চর্য লোকজ শব্দের ব্যবহার আর বিস্ময়কর সব ছবি, ছবির পরে ছবি যা ছোটোদের মনে অসম্ভবের ছন্দ সঞ্চারিত করে দেয়। তিনি মুখে মুখে রচনা করেছিলেন ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারে—যাকে কথা শিল্প বলে অভিহিত করতে আমাদের মনে কখনও দ্বিধা জন্মায় না। নিজেও আপন কলমে একটি ছোটো স্মৃতিকাহিনি রচনা করেছেন—আপনকথা —তাতে যেমন কলমের আঁচড়ে ছবি এঁকেছেন তেমনি টাইপ সাজিয়েও ছবি ফুটিয়েছেন।

আমরা অবনীন্দ্রনাথের কিশোর রচনাবলি প্রকাশ করেছি দুখণ্ডে। তাঁর অসংখ্য রচনা অবশ্য পাঠ্য রচনাগুলি নির্বাচিত করে ছোটোদের হাতে তুলে দিচ্ছি। তাঁর বিচিত্রধর্মী রচনাবলি দুখণ্ডে এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যাতে পাঠক প্রতি খণ্ডেই বিভিন্ন ধরনের রচনার স্বাদ পান।

অবনীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃজন বিষয়ে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে দিয়েছেন অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। রচনাবলি সংকলনে ও প্রকাশনায় যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ।

আশাকরি, আমাদের অন্যান্য কিশোর সাহিত্য সংগ্রহের মতো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সমগ্র ছোটোদের কাছে আকর্ষণীয় হবে।

জানুয়ারি ২০১৩

অশোককুমার মিত্র

শকুন্তলা

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়ো বড়ো বট, সারিসারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোটো নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড়ো স্থির—আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলই দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোটো ছোটো পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোটো ছোটো হরিণশিশু, কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কতগুলি ঋষিকুমার।

তারা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

আর কী করত?

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাই-বাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণুবাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল—খেলবার সাথি বনের হরিণ, গাছের ময়ূর; আর ছিল—মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধ কথা, তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলই ছিল, ছিল না কেবল—আঁধার ঘরের মানিক—ছোটো মেয়ে—শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরি মেনকা তার রূপের ডালি—দুধের বাছা—শকুন্তলা-মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল।

বনের পাখিদের দয়ামায়া আছে, কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল!

খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফল ফুল কুড়োতে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে; তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে

কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা-গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হল তখন তাত কণ্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপনার হল। তাত কণ্ব তার আপনার, মা-গৌতমী তার আপনার, ঋষিবালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাইবাছুর—সে-ও তার আপনার, এমন কি—বনের লতাপাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল—তার বড়োই আপনার দুই প্রিয়সখী অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা; আর ছিল একটি মা-হারা হরিণশিশু—বড়োই ছোটো—বড়োই চঞ্চল। তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ—ঘরের কাজ, অতিথি-সেবার কাজ, সকালে-সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ; আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল—তারা প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন সখী শকুন্তলার বর আসবে।

এ-ছাড়া আর কী কাজ ছিল?—হরিণশিশুর মতো নির্ভয়ে এ-বনে সে-বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতাবিতানে গুন্ গুন্ গল্প করা, নয় তো মরালীর মতো মালিনীর হিম জলে গা ভাসানো; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এই কাজ।

একদিন—দক্ষিণ বাতাসে সেই কুসুমবনে দেখতে দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল অনসূয়া প্রিয়ম্বদা আরও চঞ্চল হয়ে উঠল।

দুষ্মন্ত

যে-দেশে ঋষির তপোবন ছিল, সেই দেশের রাজার নাম ছিল—দুষ্মন্ত।

সেকালে এত বড়ো রাজা কেউ ছিল না। তিনি পুব-দেশের রাজা, পশ্চিম-দেশের রাজা, উত্তর-দেশের রাজা, দক্ষিণ-দেশের রাজা, সব রাজার রাজা ছিলেন। সাত-সমুদ্র- তেরো নদী—সব তাঁর রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা—রাজা দুষ্মন্ত। তাঁর কত সৈন্যসামন্ত ছিল, হাতিশালে কত হাতি ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাড়ি-খানায় কত সোনা রূপোর রথ ছিল, রাজমহলে কত দাস-দাসী ছিল; দেশ জুড়ে তাঁর সুনাম ছিল, ক্রোশ জুড়ে সোনার রাজপুরী ছিল, আর ব্রাহ্মণকুমার মাধব্য সেই রাজার প্রিয় সখা ছিল।

যেদিন তপোবনে মল্লিকার ফুল ফুটল, সেই দিন সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীর রাজা, রাজা দুষ্মন্ত, প্রিয়সখা মাধব্যকে বললেন—'চলো বন্ধু, আজ মৃগয়ায় যাই।'

মৃগয়ার নামে মাধব্যের যেন জ্বর এল। গরিব ব্রাহ্মণ রাজবাড়িতে রাজার হালে থাকে, দুবেলা থাল-থাল লুচি মণ্ডা, ভারভার ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠান্ডা রাখে, মৃগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেল, বাঘ ভালুকের ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠল।

'না' বলবার জো কী, রাজার আজ্ঞা।

অমনি হাতিশালে হাতি সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে শিকারি এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে এল। তারপর সারথি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝনঝনা দিয়ে খুলে গেল।

রাজা সোনার রথে শিকারে চললেন।

দুপাশে দুই রাজহস্তী চামর ঢোলাতে ঢোলাতে চলল, ছত্রধর রাজছত্র ধরে চলল, জয়ঢাক বাজতে বাজতে চলল, আর সর্বশেষে প্রিয়সখা মাধব্য এক খোঁড়া ঘোড়ায় হটহট করে চললেন।

ক্রমে রাজা এ-বন সে-বন ঘুরে শেষে মহাবনে এসে পড়লেন। গাছে গাছে ব্যাধ ফাঁদ পাততে লাগল, খালে বিলে জেলে জাল ফেলতে লাগল, সৈন্য সামন্ত বন ঘিরতে লাগল—বনে সাড়া পড়ে গেল।

গাছে গাছে কত পাখি, কত পাখির ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচি পাতার মতো ছোটো ডানা নাড়ছিল, রাঙা ফলের মতো ডালে দুলছিল, আকাশে উড়ে যাচ্ছিল, কোটরে ফিরে আসছিল, কিচমিচ করছিল। ব্যাধের সাড়া পেয়ে, বাসা ফেলে, কোটর ছেড়ে, কে কোথায় পালাতে লাগল।

মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠান্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে—শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতি শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে—শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।

কত পাখি, কত বরা, কত বাঘ, কত ভালুক, কেউ জালে ধরা পড়ল, কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল, কেউ বা তলোয়ারে কাটা গেল; বনে হাহাকার পড়ে গেল। বনের বাঘ বন দিয়ে, জলের কুমির জল দিয়ে, আকাশের পাখি আকাশ ছেয়ে পালাতে আরম্ভ করলে।

ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাখির সঙ্গে ছুটল, তির নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাছের সঙ্গে চলল, রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে ছুটলেন। হরিণ প্রাণভয়ে হাওয়ার মতো রথের আগে দৌড়িয়েছে, সোনার রথ তার পিছনে বিদ্যুতের বেগে চলেছে। রাজার সৈন্য-সামন্ত, হাতি, ঘোড়া, প্রিয়সখা মাধব্য, কতদূরে কোথায় পড়ে রইল। কেবল রাজার রথ আর বনের হরিণ নদীর ধার দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলল।

যখন গহন বনে এই শিকার চলছিল তখন সেই তপোবনে সকলে নির্ভয়ে ছিল। গাছের ডালে টিয়াপাখি লাল ঠোঁটে ধান খুঁটছিল, নদীর জলে মনের সুখে হাঁস ভাসছিল, কুশবনে পোষা হরিণ নির্ভয়ে খেলা করছিল; আর শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা—তিন সখী কুঞ্জবনে গুন-গুন গল্প করছিল।

এই তপোবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারও হিংসা করে না। মহাযোগী কণ্বের তপোবনে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। হরিণশিশু ও সিংহশাবক এক বনে খেলা করে। এ-বনে রাজাদেরও শিকার করা নিষেধ। রাজার শিকার—সেই হরিণ—ঊর্ধ্বশ্বাসে এই তপোবনের ভিতর চলে গেল। রাজাও অমনি ধনুঃশ্বর ফেলে ঋষিদর্শনে চললেন।

সেই তপোবনে সোনার রথে পৃথিবীর রাজা, আর মাধবীকুঞ্জে রূপসী শকুন্তলা— দুজনে দেখা হল।

এদিকে মাধব্য কী বিপদেই পড়েছে। আর সে পারে না! রাজভোগ না হলে তার চলে না, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না, পালকি ছাড়া সে এক পা চলে না, তার কি সারাদিন ঘোড়ার

পিঠে চড়ে 'ওই বরা যায়, ওই বাঘ পালায়' করে এ-বন সে-বন ঘুরে বেড়ানো পোষায়? পল্বলের পাতা-পচা কষা জলে কি তার তৃষ্ণা ভাঙে? ঠিক সময় রাজভোগ না পেলে সে অন্ধকার দেখে, তার কি সারাদিনের পর একটু আধপোড়া মাংসে পেট ভরে? পাতার বিছানায় মশার কামড়ে তার কি ঘুম হয়। বনে এসে ব্রাহ্মণ মহা মুশকিলে পড়েছে। সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে ফিরে সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, মশার জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা নেই, মনে সর্বদা ভয়—এই ভালুক এল, ওই বুঝি বাঘে ধরলে। ভয়ে ভয়ে বেচারা আধখানা হয়ে গেছে।

রাজাকে কত বোঝাচ্ছে—'মহারাজ, রাজ্য ছারেখারে যায়, শরীর মাটি হল, আর কেন? রাজ্যে চলুন।'

রাজা তবু শুনলেন না, শকুন্তলাকে দেখে অবধি রাজকার্য ছেড়ে, মৃগয়া ছেড়ে, তপস্বীর মতো সেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যে রাজার মা ব্রত করছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তবু রাজ্যে ফিরলেন না, কত ওজর-আপত্তি করে মাধব্যকে সব সৈন্যসামন্ত সঙ্গে মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা সেই তপোবনে রইলেন।

মাধব্য রাজবাড়িতে মনের আনন্দে রাজার হালে আছে, আর এদিকে পৃথিবীর রাজা বনবাসীর মতো বনে বনে 'হা শকুন্তলা! হো শকুন্তলা!' বলে ফিরছে। হাতের ধনুক, তূণের বাণ কোন্ বনে পড়ে আছে! রাজবেশ নদীর জলে ভেসে গেছে, সোনার অঙ্গ কালি হয়েছে, দেশের রাজা বনে ফিরছে।

আর শকুন্তলা কী করছে?

নিকুঞ্জবনে পদ্মের বিছানায় বসে পদ্মপাতায় মহারাজাকে মনের কথা লিখছে। রাজাকে দেখে কে জানে তার মন কেমন হল! একদণ্ড না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। দুই সখী তাকে পদ্মফুলে বাতাস করছে, গলা ধরে কত আদর করছে, আঁচলে চোখ মোছাচ্ছে, আর ভাবছে—এইবার ভোর হল, বুঝি সখীর রাজা ফিরে এল।

তারপর কী হল?

দুঃখের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখি ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কী হল?

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল।

আর কী হল?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা—দুজনে মালা-বদল হল। দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

তারপর কী হল?

তারপর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয়সখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে এল।

তপোবনে

রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুন্তলা সেই বনে দিন গুনতে লাগল।

যাবার সময় রাজা নিজের মোহর আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন— 'সুন্দরি, তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর পড়বে, নামও শেষ হবে আর বনপথে সোনার রথ তোমাকে নিতে আসবে।'

কিন্তু হায়, সোনার রথ কই এল?

কতদিন গেল, কত রাত গেল; দুষ্মন্ত নাম কতবার পড়া হয়ে গেল, তবু সোনার রথ কই এল? হায় হায়, সোনার সাঁঝে সোনার রথ সেই যে গেল আর ফিরল না!

পৃথিবীর রাজা সোনার সিংহাসনে, আর বনের রানি কুটির-দুয়ারে—দুজনে দুইখানে।

রাজার শোকে শকুন্তলার মন ভেঙে পড়ল। কোথা রইল অতিথি-সেবা, কোথা রইল পোষা হরিণ, কোথা রইল সাধের নিকুঞ্জবনে প্রাণের দুই প্রিয়সখী! শকুন্তলার মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই! রাজার ভাবনা নিয়ে কুটির-দুয়ারে পাষাণ-প্রতিমা বসে রইল।

রাজার রথ কেন এল না?

কেন রাজা ভুলে রইলেন?

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুন্তলা কুটির-দুয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে বসে রাজার কথা ভাবছে—ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময় মহর্ষি দুর্বাসা দুয়ারে অতিথি এলেন, শকুন্তলা জানতেও পারলে না, ফিরেও দেখলে না। একে দুর্বাসা মহা অভিমানী, একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায়-কথায় যাকে-তাকে ভস্ম করে ফেলেন, তার ওপর শকুন্তলার এই অনাদর—তাঁকে প্রণাম করলে না, বসতে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না।

দুর্বাসার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ছুটল, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'কী! অতিথির অপমান? পাপীয়সী, এই অভিসম্পাত করছি—যার জন্যে আমার অপমান করলি সে যেন তোকে কিছুতে না চিনতে পারে।'

হায়, শকুন্তলার কী তখন জ্ঞান ছিল যে দেখবে কে এল, কে গেল! দুর্বাসার একটি কথাও তার কানে গেল না।

মহামানী মহর্ষি দুর্বাসা ঘোর অভিসম্পাত করে চলে গেলেন—সে কিছুই জানতে পারলে না, কুটির-দুয়ারে আনমনে যেমন ছিল তেমনই রইল।

অনসূয়া প্রিয়ম্বদা দুই সখী উপবনে ফুল তুলছিল, ছুটে এসে দুর্বাসার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কত সাধ্য-সাধনা করে, কত কাকুতি-মিনতি করে, কত হাতে-পায়ে ধরে দুর্বাসাকে শান্ত করলে!

শেষে এই শাপান্ত হল—'রাজা যাবার সময় শকুন্তলাকে যে-আংটি দিয়ে গেছেন সেই আংটি যদি রাজাকে দেখাতে পারে তবেই রাজা শকুন্তলাকে চিনবেন; যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না-পড়বে ততদিন রাজা সব ভুলে থাকবেন।'

দুর্বাসার অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভুলে রইলেন!

বনপথে সোনার রথ আর ফিরে এল না!

এদিকে দুর্বাসাও চলে গেলেন আর তাত কণ্বও তপোবনে ফিরে এলেন। সারা পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন সারা পৃথিবীর রাজা বনে এসে গলায় মালা দিয়েছেন। তাত কণ্বের আনন্দের সীমা রইল না, তখনই শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠাবার উদ্‌যোগ করতে লাগলেন। দুঃখে অভিমানে শকুন্তলা মাটিতে মিশে ছিল, তাকে কত আদর করলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

উপবনে দুই সখী যখন শুনলে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি চলল, তখন তাদের আর আহ্লাদের সীমা রইল না।